Jahangirnagar University Journal of Journalism and Media Studies
Vol 2 • 2016 • ISSN 2409-479X

বাংলা চলচ্চিত্রের গান: ক্ষমতা কাঠামোয় নারী পুরুষের উপস্থাপন

তপন মাহমুদ লিমন[*]
নন্দিতা তাবাসসুম খান[**]

সার-সংক্ষেপ : বাংলা চলচ্চিত্রের একটি নিয়মিত ও আবশ্যিক অনুসঙ্গ বা আধেয় হিসেবে গান পরিবার সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোকে কিভাবে তুলে ধরে, সেটা খোঁজার জন্যই এই গবেষণা। বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যান্য আধেয়র মত গানও কি এমন কোন অর্থ নির্মাণ করে যা, সমাজের প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স বা মতাদর্শকেই তুলে ধরে? এমন প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিচেনায় নেয়া হয়েছে নর-নারীর সম্পর্ককে। নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব, মিশেল ফুকোর ক্ষমতা ও ডিসকোর্সের ধারণা ও তত্ত্ব এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের সংস্কৃতি কারখানা তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন দশকের ছয়টি গানের গুনগত আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গবেষণায়। বাছাইকৃত গানগুলোর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এতে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। নারী পুরুষের আকাঙ্খা, বিরহ বা বিচ্ছেদ সবকিছুই প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স দ্বারাই প্রভাবিত।

নিয়ন্ত্রক শব্দসমূহ: চলচ্চিত্রের গান, ক্ষমতা কাঠামো, নর-নারীর সম্পর্ক, ডিসকোর্স, জনপ্রিয় সংস্কৃতি, সংস্কৃতি কারখানা

ভূমিকা

বাংলা চলচ্চিত্রে গানের ইতিহাস বেশ পুরনো। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শুরুর দিকে জামাই ষষ্ঠী'র মধ্য দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে গানের শুরু হয়। ১৯৩২ সালে কৃষ্ণ চন্দ্র দের কণ্ঠে সৌরিন্দ্র মোহান মুখপাধ্যায় এবং রায়চাঁদ বড়ালের সুরে "ফিরে চল আপন ঘরে" গানটি প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল (সুমন চৌধুরী, ২০০৭: ১৭৮)। এর

[*] **তপন মাহমুদ লিমন:** জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

[**] **নন্দিতা তাবাসসুম খান:** সহকারী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

পরে দেখা যায় ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে "মুক্তি", "জীবন মরণ" ছায়াছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করে পঙ্কজ কুমার মল্লিক উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা যেমন পেয়েছিলেন তেমনি সমালোচিতও হয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম "ধ্রুব" চলচ্চিত্রে তার ভঁজন, কীর্তন স্বকণ্ঠে গেয়ে এবং আঙ্গুরবালাকে দিয়ে গাইয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন। ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফডিসি) যাত্রা শুরুর পর "আকাশ মাটি" ছিল প্রথম ছবি যার সুরকার ছিল সুবল দাস। ফেরদৌসী বেগম ও কলিম শরাফী ওই ছবিতে জন্য কণ্ঠ দিয়েছেন। তবে গানের জন্য প্রথম ব্যবসাসফল হয় ১৯৬৪ সালে *সুতরাং* ছবিটি। সময়ের বিবর্তনে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের কথা যেমন পরিববর্তিত হয়েছে তেমনি বদলেছে গানের সুর, সেই সাথে গানের দৃশ্যায়নও।

গণযোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র সমাজের বিদ্যমান কাঠামো ও ব্যবস্থাকে তুলে ধরে। চলচ্চিত্রের অমিত সম্ভাবনা এরকমই যে, একটি জনগোষ্ঠীর জায়মান সংকেতগুলিকে সে ধারণ করে, অনিবার্যভাবেই। এমনকি নির্মান কৌশল, আঙ্গিকগত বিভিন্নতা এক্ষেত্রে কোন বিরুদ্ধতাই সৃষ্টি করে না (হোসেন মাহমুদুল, ২০১০: ৬৮)। চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ন আধেয় হিসেবে গানও সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোকেই তুলে ধরে। গানের ভাষা অবশ্যম্ভাবীভাবেই কিছু অর্থ তৈরী করে। গানের এই ভাষাও সমাজের কোন না কোন ধরনের ডিসকোর্স তুলে ধরে এবং কখনও নতুন ডিসকোর্সের জন্মও দেয়। স্টুয়ার্ট হলের মতে, ডিসকোর্স হলো ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান উৎপাদন। যেহেতু সব সামাজিক চর্চাই অর্থ চাপিয়ে দেয় এবং আমরা যা করি, তার আদলে অর্থ তৈরী করে ও প্রভাবিত করে, সেহেতু সেইসব চর্চার একটি ডিসকার্সিভ দিক আছে। (হল, (১৯৯২), উদ্বৃত, হক, ২০০৭: ৩৩)

গত কয়েক দশকের মূলধারার বাংলা চলচ্চিত্রে মূলত পুরুষ ইমেজই নির্মিত হয়েছে। সমাজ কাঠামোর সাধারণ বিশ্লেষনে দেখা যায়, এই ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। ধর্মীয় চিন্তা ও মতাদর্শ এখানে প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স নির্মানে ভূমিকা রাখে। সেই অনুযায়ী দেখা যায়, এই সমাজ ব্যবস্থা মোটা দাগে নারী পুরুষের ভূমিকাকে একেবারে নির্দিষ্ট করে দেয়। কাজের ধরণ থেকে কথা বলার রীতি রেওয়াজ কিংবা সাজ-পেশাক সবই নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। এমনকি রং পছন্দের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য দেখা যায়। চলচ্চিত্রেও এর ব্যাতিক্রম নয়। পুরুষরা বিভিন্ন পেশাজীবীর ভূমিকায় নিয়মিত অভিনয় করলেও ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পেশাগত পরিচয় নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমিকা, বধূ, মাতা অথবা কন্যা হিসেবে তারা পুরুষের সাথে সম্পর্কিত পরিচয়গুলোতে পরিচিত। উইমেন অ্যান্ড জার্নালের প্রথম সংখ্যার সূচনা বক্তব্যে যেমনটা বলা হয়েছে, "These roles—child/woman. Whore, bitch, wife, mother, secretary or girl Friday, frigid career woman, vamp, etc were all portrayed falsely and one dimensionaly" (সুলতানা: ২০০২: ১৯৮)। বিপরীতে পুরুষকে দেখানো হয় নারীর ত্রানকর্তা হিসেবে। সমাজ সংস্কার, জনস্বার্থ, মা বোনের

নির্যাতনকারীদের শাস্তি দেয়াসহ নায়করা মহান গুরু দায়িত্ব পালন করেন এবং সফল হন। বাংলা চলচ্চিত্রে নায়ক চরিত্রের চিত্রায়ন "পুরুষ মহান ও মহানুভব" প্রচলিত এই পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকে আরও জোরদার করে (ফয়সাল ও জান্নাত, ২০১৩)। অর্থাৎ বাংলা চলচ্চিত্রে নায়ক চরিত্রের চিত্রায়ন পুরুষ মানেই সক্রিয় কোন চরিত্র। গণমাধ্যম মূলত এর নিয়ন্ত্রক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলে, যেখানে ব্যবসার ধারাবহিকতা বজায় রাখতে সবসময় প্রচলিত ইমেজ ও আধেয়র রসদ জুগিয়ে চলার পাশাপাশি অডিয়েন্সকে তাৎক্ষনিক তৃপ্তিদানের উদ্দেশ্যে আধেয়কে অগভীর ও সরলীকৃত একটি চরিত্র দেয়া হয় (সুলতানা: ২০০২: ১৯৬)। আর এই ছাঁচীকরণের মধ্য দিয়ে প্রতিদিনকার অভ্যাস-প্রথা-রীতি-ডিসকোর্স ইত্যাদি গঠন ও চর্চাকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়। আধিপত্যবাদী পুরুষের বিপরীতে নারীকে দেখা হয় বা তুলে ধরা হয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা সহ- সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে।

উপরে বাংলা চলচ্চিত্রে নর নারীর সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু গবেষণার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ ধরণের গবেষণায় কিংবা পৃথক কোন গবেষণায় চলচ্চিত্রের গান কিভাবে প্রচলিত ডিসকোর্স নির্মান করে, তা উঠে আসে নি। অথচ বাংলা চলচ্চিত্রে গান একটি শক্তিশালী আধেয়, যার প্রভাব জনমানসে বিভিন্ন সময় দেখা যায়। বর্তমান গবেষণায় খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে চলচ্চিত্রের গানে কিভাবে প্রচলিত বিভিন্ন ক্ষমতা কাঠামোয় নর নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণায় গুনগত আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গান নির্বাচণ করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে। আর বিভিন্ন দশকের (১৯৭৯-২০০০) ছয়টি গান নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন:

১. চলচ্চিত্রের গানে নির্মিত বাস্তবতা কী ধরনের অর্থ তৈরী করে?
২. এইসব গান সমাজের প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সের প্রতিনিধিত্ব করে কি?
৩. কোন ধরনের মতাদর্শ তুলে ধরে?
৪. ক্ষমতা কাঠামোয় নারী-পুরুষকে কিভাবে তুলে ধরে?

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট:

চলচ্চিত্রের গানে নারী-পুরুষ কিভাবে এসেছে একে পাঠ করতে হলে নারীবাদী চলচ্চিত্র পাঠের দৃষ্টিকোণ থেকে গানগুলো পাঠ করা যেমন জরুরি ঠিক তেমনি নারী-পুরুষের ক্ষমতা সম্পর্ক আলোচনা করার ক্ষেত্রে মিশেল ফুকোর ডিসকোর্সকে পাঠের আওতাভুক্ত করাও অপরিহার্য। চলচ্চিত্রে নারীকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয় সেই জায়গা থেকেই গড়ে ওঠে নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব। এ তত্ত্বের আলোকে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে পর্দার নারী কিভাবে পুরুষ দর্শকের ব্যক্তিগত যৌনসামগ্রীতে পরিণত হয়। কাবেরী গায়েন তার

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারীর নির্মাণ শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে লরা মালভির বরাত দিয়ে ব্যাখ্যা করেন চলচ্চিত্রে কিভাবে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে অর্থ উৎপাদিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে উৎপাদিত চলচ্চিত্রে নারী অর্থের বাহক মাত্র আর অর্থের নির্মাতা হিসেবে পুরুষ তার জায়গা করে নেয়। নারীকে প্রচলিত কাঠামোর অনুকরণে যৌনবস্তু হিসেবে দেখানো হয়। পর্দায় পুরুষ চরিত্র নারী চরিত্রকে যে যৌন আকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে দেখে তার উপর যেমন নির্ভর করে নারীর পণ্যায়িত রূপ। ঠিক তেমনি দর্শকও এই পুরুষ চরিত্র অনুসরণে একইভাবে নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে উপভোগ করে (গায়েন: ২০১৩: ৫৪)। এদিকে লরা মালভি তার চোখের আরাম ও বর্ণনাধর্মী চলচ্চিত্র প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন পৃথিবীতে হাজারো বৈষম্যের অন্যতম হল যৌন বৈষম্য। আর যৌন বৈষম্যের এই পৃথিবীতে তাকানোর যে তুষ্টি সেখানে নারী- পুরুষ এই দুই মূল ধারায় বিভক্ত। পুরুষ এখানে কর্তা এবং নারী এখানে অক্রিয়– পুরুষের দৃষ্টি সুসজ্জিত নারী শরীরের ওপরেই তার ফ্যান্টাসির প্রয়োগ করে। নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে দেখানো চলচ্চিত্র নির্মাণের অন্যতম গঠণক্রিয়া হিসেবে কাজ করে (হক: ২০০৭: ১২৫-১৩২)।

এদিকে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ঘরানার তাত্ত্বিক থিওডরো অ্যাডোর্ন এবং ম্যাক্স হর্খেইমার জনপ্রিয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোতে উৎপাদিত হয় বলে, এখানে বাণিজ্যিক স্বার্থ সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ফলে সমাজে প্রচলিত নিয়মের বাইরে এই সংস্কৃতি কখনো বিপ্লব করে না (গায়েন, ১৯৯৭: ৬৭-৯০)। ফলে তৃতীয় বিশ্বের সমাজ বাস্তবতায় পুরুষই যেহেতু অর্থনৈতিক ক্ষমতার আঁধার, সেহেতু তাকে চলচ্চিত্রের মূল ভোক্তা ধরে নারীকে পণ্যায়িত করা হয় কিংবা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো থেকে আদর্শ নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আবার নারী-পুরুষের সম্পর্কে বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামো উপস্থিত সমাজ-প্রচলিত নিয়ম বা প্রথাকেই অনুসরণ করে চলে এ ধরনের চলচ্চিত্র। এর ফলে পুরুষের আকাঙ্ক্ষা কিংবা যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বার্থ বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে পুনরুৎপাদিত হয়। যদিও নারী-পুরুষের এই ক্ষমতা সম্পর্ক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার নিজস্ব নিয়মে তৈরি করে নিয়েছে। আর এভাবেই গণমাধ্যম তার অর্থ তৈরি করে নেয়। মিশেল ফুকোর মতে অর্থ নির্মাণের ইতিহাস সরাসরি ক্ষমতা কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এই ক্ষমতা আবার শেকল আকারে কাজ করে না বরং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা জালের মত ছড়িয়ে পড়ে। অর্থ্যাৎ কেবল পারিবারিক সংগঠনের ভেতর দিয়েই পিতৃতন্ত্র তার ক্ষমতা চর্চা করে না, বরং অন্যান্য সংগঠনগুলো যেমন গণমাধ্যমও এতে ভূমিকা রাখে। অর্থ্যাৎ গণমাধ্যম আমাদের তথ্য এবং আনন্দ দেয় আর এর ছলে জ্ঞান প্রবর্তন করে এবং এর মাধ্যমে নতুন নতুন ডিসকোর্স উৎপাদন করে (ফুকো, (১৯৮০), উদ্বৃত, হক, ২০০৭: ৩৯)।

গণমাধ্যমে এই বিষয়গুলো উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাশালী পক্ষ তার পক্ষে যে জ্ঞান উৎপাদন করে তা এই প্রক্রিয়ায় সত্যে পরিণত হয় এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। অর্থ্যাৎ গণমাধ্যম সমাজে প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সে থেকে ক্ষমতা-কাঠামোকে তুলে ধরে এবং পুনরুৎপাদন করে। অন্যদিকে জনপ্রিয় সংস্কৃতি হিসেবে নারীর প্রতি পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে তার ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থ থেকে।

আকাঙ্খায় নর-নারী

" শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী / পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি-রবীন্দনাথ ঠাকুর " (ঠাকুর, ১৯৯৫: ১৫০)

গান: ১

চলচ্চিত্র: আরাধনা (১৯৭৯)

আমি তোমার বধু, তুমি আমার স্বামী / খোদার পরে তোমায় আমি বড় বলে জানি
ঘোমটাখানি খোলার আগে একটু সময় দাও / পায়ের ধুলা অভাগিনীর মাথায় নিতে দাও
না হলে নারাজ হবে অন্তর্যামি / খোদার পরেই তোমায় আমি বড় বলে জানি

নর-নারীর সম্পর্ক এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঊর্দ্ধতন-অধস্তন ক্ষমতা কাঠামোয়। আমাদের সমাজের প্রধান্যশীল ডিসকোর্স অনুযায়ী পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে পুরুষই নারীর কর্তা বা স্বামী। এই গানের নারীর কাছে তার স্বামীর স্থান খোদার পরে। বিদ্যমান ধর্মীয় মতাদর্শও এটা নির্ধারন করে দেয় যে, নারীর উপর পুরুষের অধিকার। সুরা নিসায় যেমন বলা আছে, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদেও জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং পূন্যময়ী নারীরা অনুগত ..." (সুরা নিসা: আয়াত ৩৪)। মনুসহিংতায় আছে, সদাচারবিহীন, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত বা বিদ্যাদি গুনহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা দেব সেবার ন্যায় পতির সেবা করিবেক' (মনুসহিংতা, অধ্যায় ৫, শ্লোক-১৫৪)। গানে খোদার পরে স্বামীকে স্থান দিয়ে তার মর্যাদা যেমন নিজের থেকে উপরে রেখেছেন, তেমনি " অভাগিনী " বলে তার অধস্তন অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মসমূহ যে ডিসকোর্স সমাজে চালু রেখেছে সেখানে পুরুষই স্বামী। নারী তার অধীন। দেলোয়ার হোসেন দুলালের *বড় মা* চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যে দেখা যায়, অন্যের বাড়ি থেকে চাল নিয়ে ফিরতে রাত হলে স্ত্রীকে অস্বতী বলে মার ধর করে স্বামী। পরিণতিতে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়ে স্ত্রী। কিন্তু যাবার সময়ে স্বামীর পা ধরে তিনি কেঁদে বলেন, ১২ বছর বয়সে তেমার কাছে এসেছিলাম, আলার পরে তেমাকেই বড় বলে

জেনেছিলাম, সেই তুমিই যখন অবিশ্বাস করলে তখন বেঁচে থেকে কি হবে ? পারলে সব গুনাহ মাফ করে দিও। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, নারী তার কাঁধে দোষ নিয়েও হলেও শেষ পর্যন্ত পুরুষকে দেবতার আসনেই বসিয়ে রাখে। সিনেমার নারী চরিত্রগুলো ভাগ্যদোষে বিড়ম্বিত পতিকে রক্ষার্থে অশেষ ত্যাগ ও কষ্ট শিকার করে। নিজেকে বিপন্ন করে হলেও বিপথগামী স্বামীকে ফেরাতে আত্মনিয়োগ করে (সুলতানা, ২০০২: ১৯৮)।

আজকে দু'জন দু'জনাতে পেয়েছি যে ঠাঁই
তাই তো আমি তোমার মাঝে মিশে যেতে চাই
তুমি যে শুধুই আমার তোমার আমি
খোদার পরেই তোমায় আমি বড় বলে জানি

গানের এই অংশে কিছুটা ইতিবাচক বিষয় আছে। এখানে দুজন দুজনার মাঝে ঠাঁই পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংসার জীবনে নর নারীর যে সমান ভূমিকা আছে তা বোঝা যায়। তবে পরের লাইনে, "তোমার মাঝে মিশে যেতে চাই " - এ পুরুষকে কর্তার আসনে বসানো হয়েছে। পুরুশ আশ্রয়, নারী আশ্রিত।

গান :২
চলচ্চিত্রঃ সবার অজান্তে (১৯৯৯)
চোখে যার কাজল নেই এমনি কালো
এক পলক দেখলে যারে লাগে ভালো
এমন একটি মেয়ে যদি এনে দাও কেউ
আমি করবো তারে উফ

নারীর প্রতি পুরুষের খুবই প্রথাগত প্রত্যাশা। কবিরা সনাতন যুগ থেকেই নারীর চোখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। পুরুষ বলছে , 'করবো তারে বউ'। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, পুরুষ নিজেকে ঘটনার কর্তা হিসেবে প্রকাশ করছে। কারণ এক নারীকে তিনি বউ 'করবে'ন। এবং প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স অনুযায়ী অবশ্যই তাকে দেখতে ভালো হতে হবে। পুরুষের চোখে নারীর সেই সনাতনী বর্ণনা।

কথা যদি বলে সে ঝরে হাসির বৃষ্টি
প্রাণটাকে ঘায়েল করে হরিণ হরিণ দৃষ্টি
তার হরিণ হরিণ দৃষ্টি

এ পর্যায়ে পুরুষ নারীর কথাকে হাসির সাথে তুলনা করছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জোরে কথা বলা নিষেধ। তাই মেনে নিয়েই সিনেমার নায়ক প্রত্যাশা করছেন

তার আকাঙ্খিত নারীর বাচন হবে মাধুর্যময়। দ্বিতীয় লাইনে আবারো নায়ক ফিরে আসে চোখের দৃষ্টির বর্ণনায়। হরিণের দৃষ্টি এখানে মেটাফোর ধরে নিলে তার অর্থ দাড়ায় মায়াবী দৃষ্টি। নারী মায়া এবং মাধুর্যের সমন্বয় হবে - যা প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স দাবী করে। আমাদের নায়কও তার বাইরে নয়। গানের মধ্য দিয়ে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্যশীল প্রত্যাশার কথাই ব্যাখ্যা করছে।

লাল লাল গালে যার ছোট্ট তিল
তার সাথে হবে যে আমার মিল
এমন একটি .....

নায়ক এখানে নারীর কোমল কপলের আকাঙ্খা প্রকাশ করছে। নারীর মুখমন্ডলের বর্ণনায় পুরুষের এ কামনা নতুন নয়। প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স যুগে যুগে নারীকে তার মুখমন্ডলের লাবণ্য ধরে রাখার নানা কৌশল শিখিয়ে যাচ্ছে। পুরুষ এখানে আকাঙ্খার ধারক আর নারীর কাজ সেই আকাঙ্খাকে পূরণ করা। সে কারণে 'লাল লাল গাল'-এর আকাঙ্খা আমাদের নায়কেরও। সাথেই গালে তিল থাকতে হবে শ্রাবন্তীর কারুকার্যকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য।

এলোমেলো চুলে যার খেলে দখিন হাওয়া
কামরাঙ্গা ঠোঁট দুটি শিশিরেতে ধোয়া
এমন একটি...
তুলতুল মুখে যার মায়াবী রঙ
তাকে আমি দিব যে আমারই মন
এমন একটি...

গানের শেষে এসেও পুরুষের একই আকাঙ্ক্ষা। এমন নারীর আকাঙ্ক্ষা পুরুষ করছে যার ঠোঁট হবে কামুক; যার মুখ হবে মায়াবী। সম্পূর্ণ গানটিতে পুরুষ এমন একজন নারীকে জীবনসঙ্গী করার অভিপ্রায় জানাচ্ছে যে একেবারেই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় তৈরি। যার মেধা, মনন, চেতনা, বিবেচনা কোনটিই পুরুষের কাছে প্রাধান্য পায়না। প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সে নারী শুধুই দৃশ্যবস্তু এবং অবশ্যই পুরুষ দ্রষ্টা। সেকারণে তার চেহারা, রূপ-লাবণ্যের উপরই নির্ভর করে পুরুষ তাকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করে কিনা। আর গানটিতেও বারবার তা-ই উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিরহ: সম্পর্কের জটিলতায় নর-নারী

গান : ৩

চলচ্চিত্র : ফুল নেব না অশ্রু নেব (২০০০)

নায়িকা : বিধি তুমি বলে দাও আমি কার / দু'টি মানুষ একটি মনের দাবিদার

নায়ক ১ : আমি পৃথিবীর এই বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিব / তুমি যদি আমারই না হও
নায়ক ২ : তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করোনা প্রিয়া / আমি ছাড়া তুমি কারো নও।

এ গানে প্রথমেই পাওয়া যায় নারীর সিদ্ধান্তহীনতা। 'দাবিদার' শব্দটি একরকম মালিকানা বিষয়টির মেটাফোর। নারী পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সের মধ্যে নিজেকে সম্পত্তির স্বরূপ-ই মনে করে। যে কারণে জীবনসঙ্গী হিসেবে সে কাকে বেছে নিবে তা-ও বিধির উপর ছেড়ে দিতে হয়। নিজ অস্তিত্বে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে সে অপারগ।

অপরদিকে এ গানের দৃশ্যায়ণে আমরা দু'জন নায়ক (দাবিদার!) দেখতে পাই। দৃশ্যায়ণে যাকে একটু উদ্ধত দেখানো হয়েছে তাকে ঔদ্ধত্যের সাথে বলতে শোনা যায় নায়িকাকে অর্জন (দখল!) না করতে পারলে পৃথিবী ধ্বংস করতেও সে দ্বিধা করবেন না। এক্ষেত্রেও প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সের মধ্য দিয়েই পুরুষ চরিত্র নির্মাণ। পুরুষ কখনোই হার মানতে রাজী নয়। জয়ের জন্য প্রয়োজনে সে ধ্বংস করতেও পিছপা হয়না।

আর দ্বিতীয় নায়কের কথা ধ্বংসাত্মক না হলেও কিছুটা হুমকিসুলভ। খুবই দৃঢ়তার সাথে পুরুষ নারীকে আদেশ দিচ্ছে যেন নারী কোনভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা না করে। অন্যথায়, নায়ক তার বিনম্রতা (!) -র সীমা লঙ্ঘন করতে হয়তো বাধ্য হবে।

নায়ক ১ : তুমি যদি আমারই না হবে / আমাকে মানুষ করেছ কেন তুমি তবে
নায়ক ২ : তুমি আছো এ বুকেরই নীড়ে / দেখনা প্রিয়া বুকটা আমার তুমি চিড়ে
নায়িকা : বিধি তুমি বলে দাও আমি কার / দু'টি মানুষ একটি মনের দাবিদার

প্রথম নায়কের কথায় নারীর চিরাচরিত মাতৃত্বসুলভ আচরণ পাওয়া যায়। পুরুষ হবে অগোছালো, বিশৃঙ্খল। আর নারীর পরম দায়িত্ব তাকে যত্নের সাথে পরিচর্যা করা। কিন্তু তা শর্তপ্রযোজ্য। মমতার গ্রহণের বিনিময়ে নারীকে তার সম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। নারীর বসবাস অবশ্যই নীড়ে; তা সে ইটপাথরের হোক নতুবা হৃদয়ের। পুরুষের আকাঙ্ক্ষা তা-ই। প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সে সে নারীকে বিভিন্ন বাঁধনে বেঁধে রাখতে চায়। আর নারী প্রতিবারই দ্বিধান্বিত। বিধি থেকে সে কোন সিদ্ধান্ত পাচ্ছেনা যে, সে কার সম্পত্তি, কার মালিকানায় তার মেনে নেয়া উচিত।

নায়ক ১ : আমি প্রেমে পরাজিত হলে / তোমাকে নিয়ে ওপারে আমি যাব চলে
নায়ক ২ : ভেঙোনা কো এই মন তুমি / তোমাকে ছাড়া এমন আমার মরুভূমি
নায়িকা : বিধি তুমি বলে দাও আমি কার / দু'টি মানুষ একটি মনের দাবিদার

এ পর্যায়ে নায়ক মরিয়া। প্রেমে ব্যর্থ হলে একা নয় বরং নায়িকাকে সে মৃত্যুসঙ্গী করবে। নারীর জীবনাচরণের সিদ্ধান্ত তো নারীকে কখনো দিতেই চাইনি পিতৃতন্ত্র; মৃত্যুর সিদ্ধান্তও তার হাতেই। এ গানে বারবারই পুরুষের প্রথাগত রূপই উঠে

আসে। পিতৃতন্ত্র সবসময়ই পুরুষকে দেখিয়েছে আধিপত্যশীল, বেপরোয়া, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীরূপে। এ গান তার এই বৈশিষ্টগুলোকেই পুনঃবার উপস্থাপন করে।
আর দ্বিতীয় নায়কও মরিয়া হয়ে বলে যাচ্ছে কোনভাবেই যেন তার প্রিয়তমা তার মন ভেঙে চলে না যায়। এক্ষেত্রে নায়ক চেষ্টা করছে কিছুটা বিনম্রতা বজায় রেখে অনুরোধ করার। কিন্তু তা-ও নারীর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্যই। তবে এ গানে সবচেয়ে অদ্ভুত আচরণ নায়িকার। পুরো গানে তার কণ্ঠে একটি কথাই শোনা যায়। নারী অবলা, অসহায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরাগ এবং কারো মালিকানা গ্রহণের প্রবণতা - নারীর এ রূপ চরিত্র এ গানের মধ্যে স্পষ্ট।

গান: ৪
চলচ্চিত্র: বিয়ের ফুল (১৯৯৯)
(দু'জন) ঐ চাঁদ মুখে যেন লাগে না গ্রহণ/ জোছনায় ভরে থাক সারাটি জীবন

এই গানে দেখা যায় দু নায়ক এক নায়িকার সৌন্দর্যের প্রশংসা করছে। আর এ ধরনের প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রাচীনকাল থেকে যা হয়ে আসছে তাই হচ্ছে। পুরান, রুপকথা কিংবা আধুনিক সাহিত্যেও দেখা যায় নায়ক বীর, সাহসী এবং রুপবান। আর নায়িকার চুল, মুখ, চোখ, দেহ সৌষ্ঠবের অসামন্য বর্নণা দেয়া হয়েছে। আমাদের সিনেমার গানেও তারই প্রতিফলন ঘটছে। প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সে পুরুষ মানেই কঠিন, কঠোর ও শক্তিশালী। আর নারী মানেই কোমল, দূর্বল। নারীর মুখকে তুলনা করা হয়েছে চাঁদের সাথে, যা আসলে কোমলতার, নমনীয়তার রুপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বোঝাতে এই রুপক ব্যবহার হয়। তবে পুরুষের আকাঙ্খা নারী সব সময় পবিত্র থাকবে। তার চাওয়া সেখানে যেন "গ্রহণ" না লাগে, মানে আধাঁরে ঢাকা না পড়ে। নারীর পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা বা ভাল কাজ যেনো কোন কলঙ্ক বা নেতিবাচক কোন কিছু দ্বরা আক্রান্ত না হয় এমনটাই পুরুষের প্রত্যাশা।
(প্রেমিক ১) হাজার বছর বেঁচে থাকো তুমি / বুকে নিয়ে স্বর্গের সুখ
(প্রেমিক ২) দুঃখ ব্যাথা সবই ভুলে যাই / দেখলে তোমার ঐ মুখ

নারীকে বরাবরই নিষ্ক্রিয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ও গানে। প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স অনুযায়ী পুরুষ মানে সক্রিয়, কর্মঠ। আর নারী তার সহযোগি কিংবা অনুপ্রেরণাদায়ী। বিদ্রোহী ও সাম্যের কবি নজরুল তার নারী কবিতায় লিখেছেন,"কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী, প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়ালক্ষ্মী নারী।" দেখা যায়, সমাজের প্রচলিত ও প্রাধন্যশীল ডিসকোর্সে পুরুষের হাতে তরবারি তুলে দেয়া হয়, আর নারীকে বলা হয় প্রেরণাদায়ী। নারীকে বিশেষায়িত করা হয় লক্ষ্মী বা ভাগ্যদেবী হিসেবে।

(প্রেমিক ১) ফুলও তুমি /
(প্রেমিক ২) ফাগুনও তুমি
(প্রেমিক ১) গন্ধ বিলাও সারাক্ষণ
(প্রেমিক ১) স্বপ্ন তোমার ,মনে যত আশা সবই যেন পূর্ণ হয়
(প্রেমিক ২) আমার তুমি এ পৃথিবীতে / ও প্রিয়া আর কারো নয়
(প্রেমিক ২) দিনও তুমি
(প্রেমিক ১) রাতও তুমি
(প্রেমিক ১) ফুরাবেনা কভু প্রয়োজন

আগের পঙতিগুলোর মতো, এখানেও নারীকে তুলনা করা হয়েছে কোমল, নরম অর্থ প্রকাশক রূপক, যেমন ফুল, ফাগুন দ্বারা। প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স অনুযায়ী পুরুষের শক্তিশালী চরিত্রের বিপরীতে নারীকে দুর্বল, কোমল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে "গন্ধ বিলাও সারাক্ষণ" দ্বারা বোঝা যাচ্ছে নারী তার সুবাস (যার কার্যত কোন সক্রিয়তা নাই) দিয়ে পুরুষকে মোহাবিষ্ট করে রাখে। নারী এখানে কেবল দৃশ্যবস্তু বা শোভাবর্ধনকারী বা উপকারী উপকরণ। সক্রিয় কাজে তার অংশগ্রহণ নেই। সার্বিকভাবে নারীর মধ্যে এমন একটা ইমেজ তৈরী করা হয়েছে, যেখানে একজন নারী ভাবতে বাধ্য হয়, সে পুরুষের মনোরঞ্জনের উপায়মাত্র; তার নিজের করার কিছু নেই। সে উপকরণ, কখনই স্রষ্টা বা মালিক নয়; সে সুদৃশ্য কিন্তু চালক নয়।

এই গানে আরো দেখা যায় দু নায়কই দাবি করছে নায়িকা চরিত্রের নারী শুধু তার। এই গানে প্রিয়াকে শুধু নিজের বলে দাবি করে নায়ক। নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় পুরুষের মধ্যে। বেশিরভাগ চলচ্চিত্রেই দেখা যায়, নায়ক হয় অর্থশালী অথবা অনেক সংগ্রাম করে গরীব থেকে বড়লোক হয়। আর নারীকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাখা হয় অন্যের উপর নির্ভরশীল করে। অর্থনৈতিক এই সাবলম্বীতাও পুরুষকে কর্তায় পরিণত করে, আর হয় তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। গানে নায়িকার আরো প্রশংসা করে তাকে দিন ও রাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সব সময়ই যে তার প্রয়োজন সে কথাটি বলা হয়েছে। রনজু আজিম তার এক গবেষণায় ১০ টি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সেখানে মোট ৭৬টি নারী চরিত্র ছিল, যার মধ্যে পেশাজীবী নারী ছিল ২৪ জন (আজিম রনজু, ২০০১)।

বিচ্ছেদঃ অভিমানে নর নারী
গানঃ ৫
চলচ্চিত্রঃ প্রেমের প্রতিদান (১৯৯২)
বড় আশা করেছিলাম, আমি ভালোবেসে ছিলাম
পেলাম শুধু বুক ভরা অভিমান
এ বুঝি প্রেমের প্রতিদান

বাংলা চলচ্চিত্রের এই গান দেখা যায়, নায়িকার স্বপ্ন শুধু নায়ককে ঘিরে। সমাজে পুরুষের উপর নারীর নির্ভরতার বা নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের যে প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স আছে তাই ফুটে ওঠে। বিচ্ছেদ বা বিরহের এমন গানে দেখা যায়, নারীকে তুলে ধরা হয়েছে অভিমানী হিসেবে। সব কিছুর পরও নারী প্রত্যাশা করে থাকে পুরুষের ওপর। স্টিফেন এবং হ্যারিসন (১৯৮৫) বলেছেন, আত্ম উন্মোচনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়ই কিছু কৌশল অবলম্বন করে। যেমন পুরুষ নারীর কাছে তার দূর্বলতা গোপন করে আর প্রকাশ করে তার শক্তির জায়গা। আর নারী করে ঠিক তার উল্টোটা। নারী প্রকাশ করে তার দূর্বলতা আর লুকিয়ে রাখে তার সবলতাকে। এই কারনেই নর নারীর সম্পর্ক হয়ে উঠে উর্ধ্বতন-অধস্তনের (স্টুয়ার্ট, (২০০৩), উদ্বৃত, সুলতানা, ২০১৩: ৯২) । কখনও নারী যেন পুরুষের থেকেও বেশি পুরুষতান্ত্রিক।

তুমি তো বোঝনি কত রাত আমার স্বপ্নে কেটেছে
তোমাকে ভেবে এ ঘর আমার বাসর হয়েছে
কেন হলে তুমি এত পাষাণ/ এ বুঝি প্রেমের প্রতিদান

নারীর চিন্তা এখানে চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ। তার বাসর ঘরের ঘরনী হবার ইচ্ছার বেশি কিছু নেই। আমরা পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখি এমন বিরহ প্রকাশে সে নায়িকাকে বিশ্বাসঘাতক, ছলনাময়ী হিসেবে আখ্যায়িত করে। আর পুরুষ এখানে নির্মম। নারীকে ভালবাসার কাঙ্গাল, দরদী হিসেবে তুলে ধরে প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সের প্রভাবেই। বিচ্ছেদেও ক্ষেত্রে নায়কের কষ্ট যতোটা শারীরিক বা বাহ্যিকভাবে ফুটে উঠে নারীর ক্ষেত্রে সেরকম ঘটে না। বরং তা থাকে উপেক্ষিত। আনন্দ অশ্রু সিনেমাতে নায়কের পাগল হয়ে যাওয়াকে মূখ্য মনে হয় নিঃসম্বল দুলির গ্রামছাড়া হওয়ার কাছে (তানিয়া, ২০১৩: ১০৩)।

কী করে বলোনা দু'চোখে বেদনার কান্না লুকাবো
ভাবি নি আমি পাবার আগেই তোমায় হারাবো
তবু ভালোবাসি দেব প্রমাণ / এ বুঝি প্রেমের প্রতিদান

চলচ্চিত্রে প্রেমের কারণে নায়ককে কখনও দেখা যায় মারমারির ভূমিকায়, আবার কখনও সে নিজে মার খায়। তবে নারী চরিত্রকে দেখা যায় কান্নায় চোখ ভাসাতে। এই গানেও নায়িকা সেই অসহয়ত্বের কথা তুলে ধরছে। নায়ককে সে পাষান বললেও সেই নায়কের জন্যই তার অপেক্ষা, "তবুও ভালবাসার প্রমান দেয়ার" প্রতিজ্ঞা তার মধ্যে। পুরুষতান্ত্রিক ডিসকোর্সে নারী আসলেই নীরব। এটাকে তার গুন বা সৌন্দর্য ধরা হয়। নারীর মূঢ় মূক মূর্তিকে, যোগাযোগ করতে না পারার ক্ষমতাকে সমগ্র নারীজাতির প্রতিনিধি করে উপস্থিত করা হয়। তাদের পাশে দোর্দান্ড প্রতাপে ক্রমাগত সংলাপ (প্রলাপ?) বলে যায় তাদের পুরুষ পুত্র, স্বামী বা রক্ষক। নায়ক ও পুরুষ ক্রমাগত

গালাগালি করে। নারী নীরব। কথা বলার সুযোগ তার নেই (নাসরিন, ২০০৩: ১২৬)।

গানঃ ৬
চলচ্চিত্রঃ প্রেমের সমাধি (১৯৯৬)
নায়ক :
চলে যায় প্রাণের পাখী চলে যায় / পিঞ্জর ভেঙে চলে যায়
প্রেমের সমাধি ভেঙে, মনের শিকল ছিড়ে / পাখি যায় উড়ে যায়
তোমায় পাবোনা জানি, কেবল চোখের পানি / দিয়ে গেলে আমায়

এ গানে 'পাখী' শব্দটি নারী-র মেটাফোর হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। পোষমানানো পাখীকে যেভাবে যত্নের সাথে রাখা হয়, পিতৃতন্ত্র নারীকেও ঠিক সেভাবে বেঁধে রাখার প্রত্যাশা করে। এ গানে নায়কের আক্ষেপ পাখী তার পোষ মানানোর সব চেষ্টা ছিন্ন করে উড়ে যাচ্ছে। গানের দৃশ্যায়ণে দেখা যায় নায়িকার বৌ-য়ের বেশে চলে যাচ্ছে একটি সুসজ্জিত লঞ্চে। নায়িকার সাথে বিচ্ছেদে নায়ক নদীর তীরে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং গানের মাধ্যমে বিলাপ করছে। বারবারই নায়ক নায়িকাকে পাখীর মেটাফোরে বলছে যে, সে সব শিকল ছিড়ে, পিঞ্জর ভেঙে চলে যাচ্ছে। প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সে নারী কথা রাখে না।
খাঁচার পাখী কভু খাঁচায় থাকে না / বনের পাখী বনের মায়া ছাড়ে না

এ গানের পরবর্তী কথাগুলোতেই আবার প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স ফিরে আসে। নারীর স্বাধীনতা কখনোই পিতৃতন্ত্রে কাম্য নয়। পাখী বনের স্বাধীনতা ভুলে খাঁচায় পোষ মানতে চায় না। নায়ক এ গানে এ বিষয়টিকে তুলনা করছে নায়িকার সব সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার সাথে। যেন কোনভাবেই পাখীকে পোষ মানানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নারীর স্বাধীন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া-ই এক্ষেত্রে বড় অপরাধ।
ফুল ফুটেছিল মনের বাগিচায় / পানি বিনা পাপড়ি সবই ঝড়ে যায়
কোন অপরাধে আমার প্রেমের তরী অকূলে ভাসালে
আমি ছিলাম তোমার চোখের মণি কেন আধারে ডুবালে
তুমি যাও চলে যাও / শুধু স্মৃতি রেখে যাও
তোমার স্মৃতি স্মরণে বেঁচে রব জীবনে / আমি চোখের জলে

নারী-পুরুষের সম্পর্ক ধরে রাখার দায়িত্ব পিতৃতন্ত্র নারীর উপরই দিয়েছে। পরিচর্যার মধ্য দিয়ে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কাজ করবে সে। কিন্তু নায়কের এখানে আক্ষেপ তা না করায়। নারীকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে কোন অপরাধ ছাড়াই সে

পুরুষের প্রতি অনাচার করছে। বিনা বিবেচনায় পুরুষকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে নারী - এই অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে। আর এক্ষেত্রেও পুরুষের প্রথাগত 'মহান' চরিত্র উপস্থাপিত হয়। কারণ গানটিতে বলা হচ্ছে শুধু নায়িকার স্মৃতি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে নায়ক।

তীর ভাঙা ঢেউ আমি নীড় ভাঙা ঝড় / উজান ভাটির দুনিয়াতে সবই হলো পর
চেয়েছিলাম আমি হৃদয়ে তোমার সুখের প্রদীপ জ্বালাবো
সুখে যদি থাকো আমি শত দুখে হেসে যাবো
তুমি যাও চলে যাও / শুধু স্মৃতি রেখে যাও

প্রতারিত হলেও পুরুষ সক্রিয়। নদীর ঢেউয়ের সাথে পুরুষ নিজেকে তুলনা করছে। বাঁধহীন ঢেউ যেমন নদীর কূল ভেঙে দেয় বা শক্তিশালী ঝড় যেমন সব উড়িয়ে নিয়ে যায় পুরুষের আছে সেই উদ্যমতা। কিন্তু সে বিনয়ী ; তাই উড়িয়ে বা গুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও তা সে নারীর স্বার্থে করবেনা বলে জানিয়ে দিচ্ছে। নারী যদি তাকে প্রতারণা করে সুখে থাকে তাতেই পুরুষও সুখী হবে।

উপসংহার

এ গবেষণার শুরুতে কয়েকটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণ সম্পাদন করা হয়। প্রথমেই প্রশ্ন ছিল চলচ্চিত্রের গানে বাস্তবতার নির্মাণ প্রসঙ্গে। এবং তা আসলে প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সকেই প্রতিনিধিত্ব করে কিনা। চলচ্চিত্রের গান যেহেতু নিতান্তই জনসংস্কৃতির এবং সংস্কৃতি কারখানা থেকে উৎপাদিত হয়, সেহেতু তার মধ্য দিয়ে প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সেরই প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। তবে তা একেবারেই ক্ষমতা কাঠামোর ভিতরে থেকে নির্মিত হয়েছে। বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রসমূহ নারী-পুরুষ ক্ষমতা কাঠামোকে যেভাবে তুলে ধরেছে, চলচ্চিত্রে গান তার ব্যতিক্রম নয়।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের যে পর্যায়গুলোকে এ গবেষণায় বেছে নেয়া হয়েছে তা বিবেচনায় পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোরই প্রতিফলন ঘটে বারবার। নারী-পুরুষের আকাঙ্ক্ষায় তাদের বক্তব্য স্পষ্টতই প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স দ্বারা প্রভাবিত। পুরুষ যেমন প্রত্যাশা করছে মায়াবী মুখ, হরিণ দৃষ্টি, লাল গালে তিল; অপরদিকে নারী নিজেকে অভাগিনী বলে প্রকাশ করছে। পিতৃতন্ত্রে নারীর ভাবনাও পুরুষের ভাবনার মাধ্যমে নির্মিত হয়। তাই পুরুষ যখন নিজেকে ঈশ্বরের পাশে বসায় নারী তাকে পরমেশ্বর হিসেবে মেনে নেয়।

দ্বিতীয়ত নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে পুরুষ সক্রিয়। নিজের ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রেও নারীকে সক্রিয় হতে দেখা যায়না। নারীর চিন্তার বিষয়টিকে নিয়ে গীতিকারকেও সক্রিয় দেখা যায় না। হয়তো বা সেজন্যই 'ফুল নেব না অশ্রু নেব' চলচ্চিত্রের গানে নারীকে শুধু একটি পংক্তিই বারবার আওড়াতে শোনা যায়, আর যার

মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় সম্পর্কের যেকোন জটিল পরিস্থিতিতে নারী অসহায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ।

ক্ষমতা কাঠামোয় নারী-পুরুষের উপস্থাপন প্রশ্নটি একটি মাত্রা পায় সম্পর্কের বিচ্ছেদ পর্যায়ে। নারী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিলেই সে প্রতারক বলে চিহ্নিত। পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে নেয়াই তার জীবনযাপনের উপায়। আবার প্রেমের প্রতিদান চলচ্চিত্রের গানেও পাওয়া যায় নারীর বাসর সাজানোর আকাঙ্ক্ষা। পুরুষ নারীকে দিয়ে যা ভাবাতে চায় তা-ই নারীও গ্রহণ করে নেয়। যে কারণে পুরুষ নারীকে যেভাবে বাঁধনে বাঁধার প্রত্যাশা করে, ঠিক নারীও একইভাবে বিভিন্ন বাঁধনে বাঁধা পড়ার আকাঙ্ক্ষা করে।

জনপ্রিয় সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে বাংলা চলচ্চিত্রের গানও প্রাধান্যশীল ডিসকোর্সের বাইরে আসতে পারেনা। এবং সেক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রথাগত ধারণাগুলোকে সে টেক্সট-এর মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করে। নারী-পুরুষ সম্পর্কে নানান আঙ্গিক থাকে। কিন্তু প্রাধান্যশীল ডিসকোর্স এমন কিছু বিষয়কেই বেছে নেয় যা আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার টিকে থাকা বা 'স্টাটাস কো' নিশ্চিত করে। গণমাধ্যম নারী-পুরুষ সম্পর্কের উপস্থাপনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক ডিসকোর্স নির্মাণ করে। আর চলচ্চিত্রের গানও এর ব্যতিক্রম নয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. আজিম, রনজু (২০০১)। "ঢাকাই চলচ্চিত্রে নারী"। *রেটেরিক*। রাজশাহী , চলচ্চিত্র সংখ্যা ।

২. গায়েন, কাবেরী (২০১৩)। *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী-নির্মাণ*। ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স।

৩. গায়েন, কাবেরী (১৯৯৭)। 'ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের 'সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি' ধারণা: একটি তত্ত্বীয় পর্যালোচনা' *Administrative Communication and Society*, Vol.1,No.1.

৪. চৌধুরী, সুমন (২০০৭)। " চলচ্চিত্রের গান" । *পরিবেশনা শিল্পলকলা*। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৯৫), 'মানসী', চৈতালী। *সঞ্চয়িতা*। ঢাকা, কাকলি প্রকাশনী।

৬. নাসরীন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল (২০০৮)। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প: সংকটে জনসংস্কৃতি*। ঢাকা: শ্রাবন প্রকাশনী।

৭. নাসরীন, গীতি (২০০৩)। "ভাবপ্রবণ থেকে উন্মাদ: রুপালী পর্দার নায়কের বিবর্তন"। *দৃশ্যরূপ*। মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত, সংখ্যা: ১।

৮. ফুকো. এম, (১৯৮০)। পাওয়ার অব নলেজ। ব্রাইটন: হার্ভেস্টার। উদ্বৃত, হক, ফাহমিদুল (২০০৭), 'রেপ্রিজেন্টেশন' । *যোগাযোগ।* ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন সম্পাদিত, সংখ্যা: ৮, ঢাকা।

৯. ফয়সাল, হাসান মাহমুদ ও জান্নাত, রুবাইয়া (২০১৩)। "সততা ও সহিংসতায় বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রের নায়ক"। ঢাকা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, সংখ্যা:৬।

১০. মনুসংহিতা, অধ্যায়-৫, শ্লোক-১৫৪, অনুবাদ, যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ভরতচন্দ্র শিরোমনি, ১৮৬৬, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। [পিডিএফ] available at: https://bn.wikisource.org/wiki/□□□:□□□□□□□_(□□□□□_□□ □□□□□□□□□□_ও_□□□□□□□_□□□□□□□).pdf/৩১৬

১১. সুরা আন নিসা, আয়াত: ৩৪, [অন লাইন], available at: https://www.hadithbd.com/tafsir.php?suraNo=4

১২. সুলতানা শেখ মাহমুদা (২০০২)। "ঢাকার চলচ্চিত্রে নারী: দানব, দেবতা ও পতির রাজ্যে - এক্সট্রা ও সতী, " নাসরীন, গীতি আরা, মফিজুর রহমান ও সিতারা পারভিন সম্পাদিত, *গণমাধ্যম ও জনসমাজ*। ঢাকা, শ্রাবন প্রকাশনী।

১৩. সুলতানা, তানিয়া (২০১৩)। " ঢাকাই চলচ্চিত্র: নর-নারীর সম্পর্ক"। *যোগাযোগ*। ঢাকা, সংখ্যা: ১১।

১৪. স্টুয়ার্ট, লিয়া পি., (২০০৩)। জেন্ডার অ্যান্ড কমিউনিকেশন। বোস্টন: পিয়ারসন এডুকেশন ইনক। উদ্বৃত, সুলতানা, তানিয়া (২০১৩)। " ঢাকাই চলচ্চিত্র: নর-নারীর সম্পর্ক"। *যোগাযোগ*। ঢাকা, সংখ্যা: ১১।

১৫. হক, ফাহমিদুল (২০০৭)। 'চোখের আরাম ও বর্ণনাধর্মী চলচ্চিত্র'। *যোগাযোগ* । ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন সম্পাদিত,সংখ্যা: ৮, ঢাকা।

১৬. হল, এস, (১৯৯২)। ' দ্য ওয়েস্ট এন্ড দ্য রেস্ট, হল, এস এবং গিবেন, বি (সম্পা), ফর্মেশনস অব মর্ডানিটি। কেম্ব্রিজ: পলিটি ওপেন ইউনিভার্সিটি। উদ্বৃত, হক, ফাহমিদুল (২০০৭), 'রেপ্রিজেন্টেশন'। *যোগাযোগ।* ফাহমিদুল হক ও আ-আল মামুন সম্পাদিত, সংখ্যা: ৮, ঢাকা।

১৭. হোসেন, মাহমুদুল (২০১০)। "জাতীয় চলচ্চিত্র: পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা"। *সিনেমা*। ঢাকা: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।